অসময়

অনিল ঘড়াই

থানা থেকে ফেরার সময় ঝুমুরের আর পা চলছিল না। ভার হয়ে আসছিল পুরো শরীর। চোখ দুটি ক্লান্তিতে ঢুকে যাচ্ছিল কোঠরে।

বড়বাবুর আদেশ, অমান্য করা যায় না। তাছাড়া সদর থেকে চাপ আসছিল সোমাকে খুঁজে বের করতেই হবে। তা না হলে দলের মান-সম্মান থাকবে না। গ্রামের মানুষের আস্থা হারাবে পার্টি। নানা টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে সময় পার হচ্ছিল ঝুমুরের। যে যাই তাকে সান্ত্বনা দিক্ সবই কচুপাতার জলের মতো পিছলে যাচ্ছিল তার মন থেকে।

থানার গাড়িটা এসেছিল ভোরবেলায় টহলদারি শেষ করে। টালির ঘরের সামনে জিপ দাঁড় করিয়ে বারকয়েক হর্ণ বাজিয়েছিল ড্রাইভার। এই আওয়াজ চেনা হয়ে গিয়েছে ঝুমুরের। তীক্ষ্ণ শব্দটা কানে ঢুকলেই ঝুমুরের মনটা কেমন উতলা হয়ে ওঠে। বুক ধড়ফর করে। একটা ডাহুক পাখি নীচু গলায় ডাকতে থাকে।

থানার গাড়ি আসা মানে বিশেষ কিছু খবর আসা। বৃহস্পতি গলা খেঁকারি দিয়ে বলেছিল— দেখো বউমা, মনে হয় ওরা এসেছে।

ওরা বলতে থানার জিপ। মেজবাবু, জনাকয়েক পুলিশ আর উসকো- খুশকো চেহারার সোম। চোখে জলচিক্‌চিক্ আগ্রহ নিয়ে প্রতিবার বাইরে এসে হতাশ হয়েছে ঝুমুর। সবাই এসেছে, অথচ যার আসার কথা সে নেই। বুকটা নিমেষে শূন্যতায় ভরে গেলে বুক ফেটে জল আসে ঝুমুরের। বুড়ো, অথর্ব শ্বশুর তখন সান্ত্বনা দেয় তাকে— কোঁদো না বউমা, কেঁদো না। চোখের জল বাঁচিয়ে রাখো। আমি মরলে কাঁদার কেউ নেই। মুখে আগুন দেবারও কেউ নেই। অন্তত তুমি দুফোঁটা চোখের জল ফেলো।

সকাল হতে না হতেই চটপট তৈরি হয়ে আলো ফোটার অপেক্ষা করছিল ঝুমুর। বুড়ো বৃহস্পতিও সারা রাত ঘুমোয়নি। ছেলের চিন্তায় বুড়োটা মনে হয় আর বেশিদিন শ্বাস নেবে না। সবসময় ঘোরের মধ্যে থাকে, আর আপন মনে 'সোম' বলে চেঁচিয়ে ওঠে। তার এই গোঙানী বিড়বিড়ানি বাতাস বয়ে নিয়ে যায়া সারা গ্রামে। তবু বুকের পাথর নামে না বৃহস্পতির। চোখ টনটন করে জলে। ভার হয়ে ফুলে থাকে চোখের পাতা। মেটো রঙের ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপে। দুর্বল শরীরটা তার জ্বোরো রুগীর মতো কাঁপতে থাকে খাটিয়ায়।

থানা চারমাইল পথ, তবু যেতে আসতে দম বেরিয়ে যায় ঝুমুরের। এর আগে সাথে কেউ না কেউ আসত। এখন সে একাই আসে। এ তো এক-আধ দিনের ঘটনা নয়। এখন তাকে প্রায়ই আসতে হয়।

প্রথম যখন সে থানায় আসে, তখন সে সাত মাসের পোয়াতি। তার আগের দিন বাপের ঘর থেকে সাধ খাইয়ে গিয়েছে তাকে। সোমকে আশীর্বাদ করে তার মা বলেছে— দেখো বাবা, আমার মন বলছে-তোমাদের নিশ্চয়ই ছেলে হবে।

সোম বিনীত উত্তর দিয়েছে— মা, আমার কাছে ছেলে-মেয়ে সব সমান। এই ডান চোখ আর বাঁ চোখের মতো। যে আসে সে যেন ভালো থাকে। এই আশীর্বাদ করো মা।

পথের ধুলো পা ছাপিয়ে পাড় ছুঁয়েছে শাড়ির। থানার নিমতলায় দাঁড়িয়ে ঝুমুর ভাবছিল। আজ ঘরে গিয়ে শ্বশুরকে কী জবাব দেবে? রোজ রোজ শূন্যহাতে ফিরে যেতে ভালো লাগে না তার। মনটা ব্লেড দিয়ে চেরা হয়ে যায় বারবার। সোম কি বেঁচে আছে? বেঁচে থাকলে কোথায় আছে? কেন ঘরে আসছে না সে? ঘরে ফিরতে ওর কিসের ভয়? একবার কী ওর ছেলেকে দেখতে মন চায় না? রবির গায়ের রং টুকটুকে হয়েছে। একেবারে সোনার টুকরো। ছোটবেলায় কেষ্টঠাকুরের মতো দেখতে, অবিকল নাড়ুগোপাল। ঝুমুর মনে মনে ভেবেছিল—নাদুস নুদুস ছেলেটার নাম 'গোপাল' রাখবে। কিন্তু বৃহস্পতি বাধা দিয়ে বলল—না বউমা, ও গোপাল কেন হবে? ও আমাদের রবি! ওর বাপ সোম, ওর ঠাকুর্দা বৃহস্পতি। চার মাস পরে সেই প্রথম বুড়ো মানুষটাকে হাসতে দেখেছিল ঝুমুর। কষ্ট ভুলে সেও তাকিয়েছিল রবির মুখের দিকে। হ্যাঁ, এর নাম রবি হওয়াই উচিত। এই দুঃখের দিনে ওতো আঁধার ঘরের আলো। সূর্যের আলো।

কাঁখে ছেলেকে নিয়ে হাঁটা সব মায়ের পক্ষেই কষ্টের, বিশেষ করে নতুন মা হয়েছে যারা। ঝুমুর ট্রেকারে করে পিচ রাস্তা অবধি এসেছিল। তখন থেকে পিচরাস্তা ধুলো পথ। গরমে ঝুলোর ঘুর্ণি ওড়ে, বর্ষায় চ্যাটচেটে এঁটেল কাদায় ভরে যায়। কত কষ্ট করে গ্রামের মানুষগুলো পিচ রাস্তায় পৌছোয়। তাদের কথা কেউ ভাবে না, ভাবতে চায়ও না। ঝুমুরের মাথাটা টনটন করে ওঠে। কে সত্যি? এরা? না ওরা?

শনি একদিন দুয়ারে দাঁড়িয়ে গলার রগ ফুলিয়ে বলল— এসব বেশিদিন চলতে দেব না। ভেঙে সব গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেব। প্রতিশ্রুতি দিয়ে যারা প্রতিশ্রুতি রাখে না, তাদের সাথে কোন সমঝোতা হয় না।

শনি-ভগত আর রক্তিম —এই তিনজনে মিলে পোস্টার মেরেছে সারা গ্রামে। স্কুলের দেওয়ালগুলো ভরিয়ে দিয়েছে আলকাতরা লেখায়। স্লোগান পড়ে বুক কেঁপে ওঠে ঝুমুরের। ভয় এসে খাবলা মারে মনের ভেতর। সোম ঘরের কপাট বন্ধ করে দিয়ে নীচু স্বরে ঝুমুরকে বলে— বড়ো খারাপ সময় আসছে গো! আজও একজন খুন হয়ে গেল বাজারে। দোকানপাট সব বন্ধ।

ঝুমুর সংশয় ভরা কণ্ঠে বলেছিস— কারা এসব করছে। ওদের কি উদ্দেশ্য?

—জানি না। আমাকে মিটিংয়ে যেতে বলেছিল। আমি যাইনি। রবিবার না কি হাট-মিটিং হবে। সেখানে আমাকে থাকতে বলেছে। চিন্তায় কপালে ভাঁজ পড়ল সোমের। গলা শুকিয়ে খড়খড়ে শোনাল তার কণ্ঠস্বর।

চিন্তাটা ঝুমুরের কম নেই। বড় ইস্কুলে গোপন মিটিং ডেকেছিল রক্তিম। গ্রামের যে সব যুবকেরা সেই মিটিংয়ে যায়নি, তাদের ভালো চাখে দেখছে না শনির দল। সোম ইস্কুলে দারোয়ানির কাজ পেয়েছে বছর চারেক। আগে ইস্কুলের চৌকিদার ছিল বৃহস্পতি। তার ডানদিকটা প্যারালাইসিসে পড়ে যাওয়ায় পর স্কুল কমিটি তাকে বসিয়ে দিয়ে তার ছেলে সোমকে নিল।

মাস গেলে সোম মাইনে পায়। বুড়ো বাপের দেখভাল করে। ঝুমুরকে বউ হিসেবে পেয়ে তার ভাগ্য একেবারে পদ্মফুলের মতো ফুটে উঠেছে।

বেশ চলছিল দিনগুলো। ঝুমুর সংসারের কাজে ডুবে থাকে অষ্টপ্রহর। ওর লাল ঠোঁটের হাসি পুরো মুখটাতে ছড়িয়ে পড়ে জ্যোৎস্না ঢেলে দেয়। আর সেই প্লাবিত জ্যোৎস্নায় ওর শাঁখ-সাদা শরীরটা ভরা ফুলগাছের চেয়েও আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। বিছানায় ঝুমুর একেবারে ছুঁয়ে দেওয়া দুধেলতা। সোম তাকে চটকালে 'ব্যাথা লাগছে' বলে নরম খড়ছাতুর মতো মুখ করে তাকায়। সোমের চোখে তখন আঁকা হয়ে যায় ভবিষৎ -এর স্বপ্ন। ঝুমুরের শরীরে মিশে গিয়ে সে বলে, তোমার জন্য আমি ইট কিনে পাকাঘর বানিয়ে দেব। কলধার, তুলসীতলা—সব লাল সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে দেব। রাস্তা দিয়ে লোক গেলে আমার ঘরটাকে তারা টেঁরিয়ে টেঁরিয়ে দেখবে।

ঘরের মাথায় টালি চাপিয়ে হাওয়া হয়ে যায় সোম। সেই রাতটার কথা প্রতি মুহূর্তে মনে পড়ে ঝুমুরের। আর মনে পড়লে দলা পাকানো কান্না গাববিচির মতো আটকে যায় গলায়। করকর করে চোখ। কোথা থেকে হুড়মুর করে জল এসে ভাসিয়ে দেয় সব।

মাঝরাতে খেয়ে - দেয়ে সবে শুয়েছে ওরা। হঠাৎ সদর দরজায় শিকল নাড়ার শব্দ। শব্দটাই প্রথম থেকে মনে ভয় ধরিয়ে দিল। লুঙ্গিতে গিঁট দিয়ে ঝুমুরের দিকে তাকাল সে। ঝুমুর দুই ঠোঁটে তর্জনী ঠেকিয়ে নীরব থাকতে বলল সোমকে।

সাড়া না পেয়ে একসময় দরজা ভেঙে ফেলার আয়োজন করল ভগত। গলার রগ ফুলিয়ে বলল—দু' মিনিটের মধ্যে দরজা না খুললে লাথ মেরে দরজা ভেঙে দেব।

ভয়ের হিমসাপ বারবার ছোবল মারল ঝুমুরের বুকে। সোমকে টানতে টানতে নিয়ে গেল ঘরের কোনে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বলল—চটজলদি জামাকাপড় পরে নাও, আমার এই সোনার হারটা রাখো। জানলা খুলে দিচ্ছি খিড়কি দরজা দিয়ে পালিয়ে যাও।

—না, আমি যাব না। জেদে ঠোঁট কামড়ে ধরল সোম। ওরা মারলে, আমিও মারব। তবু তোমাকে এ অবস্থায় ছেড়ে আমি আমি যাব না। আমার টাঙ্গিটা দাও। দেখি, ওদের হিম্মৎ কত!

—ওদের কাছে বন্দুক আছে। রিভলবার আছে।

—থাকুক। এভাবে দগ্ধে দগ্ধে বাঁচার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো।

সোমের মুখে হাত চাপা দিয়ে তার বুকে সেঁটে যায় ঝুমুর। চোখের জলে বুক ভিজিয়ে বলে— আমি তো একা নেই, তোমার ছেলে তো গর্ভে আছে। তুমি সাবধানে যেও। রাত কেটে গেলে আবার দেখা হবে।

সোমকে খিড়কি দুয়ার পার করে দিয়ে ঘুম চোখে দরজা খুলল ঝুমুর। দরজা খোলার সাথে সাথেই তিন ব্যাটারি চর্টের আলো বাঘের থাবার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল তার মুখের উপর। বুনো হাওয়ার মতো ঘরে ঢুকে এল ওরা চারজন। সবাই তাড়া - খাওয়া শেয়ালের মতো হাঁপাচ্ছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে ভগত বলল—ভাবী সোম কোথায়?

—সে তো ঘরে নেই। মামুঘর গিয়েছে।

—ওঃ! বেশ মিথ্যে বলতে শিখেছো।

—মা কালীর দিব্যি, এক বর্ণও মিথ্যে বলছি না। জিভ বের করে মুখ কিরে কাটার শব্দ করল ঝুমুর। তারপর ওদের মতিগতি বুঝে নিয়ে বলল—তোমরা বসো। বড্ড হাঁপিয়ে গিয়েছো দেখছি। কী ব্যাপার?

—কিছু নয়। ভগত ঢোক গিলল। পুলিশ জংগল ঘিরে ফেলেছে। কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয় পালিয়ে এলাম। যদি এখানে আসে, তুমি বেমালুম না করে দেবে।

—সে আর বলতে? শাড়ি গুছিয়ে ঝুমুর ডিবরির বাতি উসকে দিতে গেলে বাধা দেয় চৈতন্য, আলো বাড়িও না, বাইরে লোক টের পেয়ে যাবে। বাতি যেমন জ্বলছে তেমন থাকতে দাও। চৈতন্য ঘরের চারপাশে তাকাল। তার সতর্ক দৃষ্টি স্বস্তিতে বলল —বৌদি, বড্ড খিদে লেগেছে। বনবাদাড়ে ঘুরে ঘুরে খিদেটা বড্ড বেড়েছে। ঘরে কিছু খাবার হবে?

ঝুমুর মুড়ির টিনের কাছে এগিয়ে যেতেই ভগত সামান্য রুষ্ট হয়েই বলল—মুড়ি-ফুড়ি দিয়ে কাজ হবে না। দুটো ভাত রেঁধে দাও।

মাঝরাতে ভাত চড়াল ঝুমুর।

কাঠের চুলায় ভাত যখন ফুটছে, তখন রক্তিমের হুঁশ হল বুড়ো বৃহস্পতির কথা। অবাক হওয়া গলায় সে শুধোল—তোমার ঘরের ঘাটের মড়াটা কোথায়?

—বাবা তো ঘরে শোয় না। রাধামাধবের মন্দিরে গিয়ে শোয়।

—প্যারালাইসিস ভালো হয়ে গেছে? চৈতন্যর গলায় ঠাট্টার ঢেউ উঠল।

ঝুমুর ভয়হীন চোখে ওর দিকে তাকাল। কেননা, চৈতন্য ওর স্ফীতকায় গর্ভের দিকে বারবার শকুন চোখে তাকাচ্ছিল। গ্রামের চেনা মানুষগুলো কত যে পাল্টে গেল এক বছরে! ওদের চোখে - মুখে, চালচলনে আগের সেই গ্রাম্য সরলতা নেই। চিমড়ানো শুকনো লতার চেহারা নিয়ে ওরা কি করতে চায়?

—তোমার শ্বশুর বুড়ো কোথায় বললে নাতো?

—বললাম তো! খানিকটা ধমকের মতো শানাল ঝুমুরের গলা। বাবা এখন লাঠি ধরে হাঁটতে পারে। বয়স হয়েছে। যতটুকু হাঁটাচলা করে তাতে আমরা খুশি।

চারটে থালায় ধোঁয়া ওঠা ভাত বেড়ে দিল ঝুমুর। ডাল, ভাত আর আলুমাখা। খেতে খেতে রক্তিম বলল—মিরচা হবে?

পিঁড়ির পাশে ওদের আগ্নেয়াস্ত্রগুলো রাখা আছে নিরীহ নির্জীব কোন শবের মতো। ঝুমুর চাইলেই এর যেকোন একটা তুলে নিয়ে ওদের চারজনকেই খতম করে দিতে পারে। কিন্তু সে তা করল না। মুখ নীচু করে ওদের স্পর্শ এড়িয়ে সে হেঁটে এল সবজি-ঝুড়ির কাছে। গোটা দশেক কাঁচা লঙ্কা নিয়ে সে নামিয়ে রাখল মেঝেতে। চৈতন্য এতে অপমানিত বোধ করল। কাজটা ভালো করলে না বৌদি। লঙ্কাগুলো পাতে দিতে পারতে। পাতে না দিলে হাতে দিতে পারতে। এভাবে মাটিতে রাখা কী তোমার উচিত হল?

—এমনিতেই সম্পর্কগুলো ঝালের চেয়ে কড়া। হাতে বা পাতে দিয়ে আমি আর বিষিয়ে তুলতে চাই না। গাঁ-ঘরের মেয়ে হয়ে এ আমি কি করে করি বলো! ঝুমুরের ব্যাখ্যা শুনে চৈতন্য হাঁ হয়ে যায়।

আঁধার ধীরে ধীরে ফরসা হয়ে ওঠে পূর্বদিগন্তে। লাল মুখ বের করে মাছ-লজেন্স চুষতে থাকে কেউ যেন। আর ঝুঁকি না নিয়ে ওরা নেমে আসে ধুলোপথে। ফিরে যাওয়ার আগে দুটি চালঘরে এবং একটি সারের দোকানে আগুন ধরিয়ে দেয় ওরা। কুন্ডলী পাকানো ধোঁয়ার ভেতর ঘোলাটে সূর্য উঁকি মারে।

পিচ রাস্তার ওপর লোকজনের সামনে বুকে গোঁত্তা মারে শিশু রবি দুধ খাওয়ার জন্য। বুকের দুধ ছাড়া ছেলেটা আর কিছু খেতে চায় না। সোম ঘর ছাড়ার পর থেকে ঘরের ওপর টান কমে গেছে ঝুমুরের। বুড়ো বৃহস্পতি সব বিষয় আশয় লিখে দিয়েছে ঝুমুরের নামে। এত কিছুর পরেও খাঁ খাঁ করে ঝুমুরের মনটা। সব সময় মনে পড়ে—এই বুঝি সে ঘরে এল। দরজা খুলে ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই জড়িয়ে ধরল তাকে। সেই রাতে সোমকে ঘর ছেড়ে যেতে বলাটা মনে হয় উচিত হয়নি। চৈতন্যরা ওকে কি খুন করে ফেলত নাকি? ঝুমুরের অতিরিক্ত ভয় পাওয়াটাই বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন। ভয় পেয়ে মানুষের জয় হয় না, হয় শুধু ক্ষয়। সোম ঘর ছেড়ে যেতে চায়নি। গর্ভবতী স্ত্রীকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে কেউ কি পালিয়ে যায়?

কতগুলো মাস - দিন চলে গেল তবু আজও সোমের দেখা নেই। কোথাও খুন হওয়ার সংবাদ পেলে অস্থির হয়ে ওঠে ঝুমুর। লোক পাঠিয়ে খোঁজখবর নিয়ে আসে। তারপর তার মনটা শান্ত হয়।

আজও একটা লাশ থানায় এসেছিল। খবরটা পেয়েই ঝুমুরের মন আর ঘরে থাকল না। বুড়ো শ্বশুরের পা ছুঁয়ে সে বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। থানা চত্বরে চেনাজানা একজন পুলিশ তাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল। চল, লাশটা তোমাকে দেখিয়ে নিয়ে আসি। তোমার দেখা হয়ে গেলে পোস্টমর্টেমে পাঠাব।

থানার সামনে নিমগাছের গোড়াটা সিমেন্ট ইট দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছে দয়ালু বড়বাবু। গত বছর এই থানার কালীমন্দিরে পূজো হয়েছিল ধুমধাম করে। প্রায় হাজারখানেক মানুষ খিচুড়ি প্রসাদ খেয়েছে।

এমন নিমগাছের ডাল থেকে ঝুলছে আসামী ফাঁসানোর পুঁটলি। তিনটে ভাঙাচোরা মোটর সাইকেল বাইরে জলহাওয়ায় জং ধরে গিয়েছে। এছাড়া লাটদেওয়া আছে গোটা পনের লজ্‌ঝড় সাইকেল। এসব সাইকেল যে কার, এর কোন ঠিকানা নেই। যতবারই থানায় আসে, এসবই দেখে ঝুমুর। থানা বড় আজব জায়গা। হাড়ে হাড়ে সে টের পায়।

রবিকে কোলে নিয়ে ভ্যান - রিকশার দিকে ধীরপায়ে এগিয়ে গিয়েছিল ঝুমুর। বুক ধুঁকপুঁক করলেও না গিয়ে তার উপায় নেই। শবের মুখের কাপড় সরিয়ে ভ্যান মালিক বলল— কৈ আসো গো মা! দেখো। প্রাণভরে শেষ দেখা দেখে নাও।

ঝুঁকে পড়ে দেখতে হল না ঝুমুরকে। মাত্র তিনহাত তফাতে দাঁড়িয়ে সে স্পষ্ট দেখতে পেল শুয়ে থাকা মৃতদেহটা সোমের নয়। বুকে ভরসা এল তার। তবু কীসের তাড়নায় চোখ ভিজে উঠল তার। রবির চোখে হাত চাপা দিয়ে সে একরকম দৌড়ে চলে এল নিমগাছের ছায়ায়। ঘনঘন শ্বাস ছাড়ল বুক কাঁপিয়ে। শিশু রবি তখন মায়ের ধুধ খাওয়ার জন্য কাঁদছে। ওর আর দোষ কোথায়। সে কোন সকালে ঘর ছেড়েছে ঝুমুর। আসার সময় দুধ-সাগু খাইয়েছে রবিকে। বুড়ো মানুষটার খাওয়ার জোগাড় করে আসতে হয়েছে তাকে।

থানা। চারদিক থেকে থানা ঘেরাও করে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল ওরা। টানা একঘন্টার লড়াইয়ের পর পিছু হাটতে বাধ্য হল পুলিশ। আগ্নেয়াস্ত্র ছিনতাই করে পুলিশ ক্যাম্পে আগুন ধরিয়ে দিল ওরা। লেপ, তোশক, কাগজপত্র, জামা-কাপড়, মশারি পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ওরা চলে যাবার পরও কেরোসিনের গন্ধে বাতাস দুঃখী হয়ে রইল।

মন্ত্রী আসার কথা ছিল গ্রামে। খবরটা সর্বপ্রথম ঝুমুরের কানে তোলে সোম। উদ্বেগে-আশঙ্কায় চোখ ছোট হয়ে আসে ঝুমুরের। সে বুঝতে পেরে বলল—অত ভয় পাও কেন? মিটিংয়ে যেতে হবে এমনতো মাথার দিব্যি দেওয়া নেই। যাওয়া-না যাওয়া যে যার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

তা বললে হয়। ওদের তো চেনো। সোমের কাঁচুমাচু মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলেছিল ঝুমুর। তুমি কি করে গ্রামের ইস্কুল পাহারা দাও বলোতো? চোর আসলে ভয়েই তোমার হাত-পা কাঁপবে। কাঁপা হাতে তো লাঠিও ধরা যায় না!

শেষপর্যন্ত মিটিংয়ে যায়নি সোম। রাগ সামলাতে না পেরে শনি পরের দিন সাঁঝবেলায় এসেছিল তার বাড়িতে। রীতিমতো শাসিয়ে গেল তাকে। তোর বউ বিধবা হলে তাকে কিন্তু আমরা খাওয়াতে আসব না। আমরা এক গাঁয়ে থাকলেও আলাদা গাছের পাতা। যেমন ধর - তুলসীপাতা আর বিচুঁটি পাতা এক নয়। এই উগ্র শনিকে সোম কি আগে চিনত? মানুষ এত বদলে যায় কী করে! বয়স বাড়লে কি চোখের পাতা উল্টে যায়? সম্পর্ক মুছে দেবার প্রবণতা বাড়ে? সোমের বিয়েতে এই শনিই মাইক বাজিয়ে নাচছিল খুব। তার নাচ দেখে ঝুমুরও হেসে কুটি কুটি। সারা রাত ঝুমুরকে বিশ্রাম নিতে দেয়নি এই শনি। ঠাট্টা আর ইয়ার্কিতে রাত যে কি ভাবে ভোর হয়ে গেল কেউ টের পেল না।

গ্রামের লোকজন বলে— শনির দুহাত খুন করার জন্য তৈরি হয়েছে। সে কালযুগ, অসময়! তার মতের সঙ্গে মত জুগিয়ে চলতে না পারলে বিপদের আর শেষ থাকে না। বড় প্রতিহিংসা পরায়ণ এই শনি। বিজ্ঞানের মাস্টার রতনবাবু শনিকে এই হিংসার পথ পরিত্যাগ করার কথা বলেছিল। শনি তার কথা কানে নেয়নি। মানুষের মুক্তির স্বপ্ন তার মাথার মধ্যে হামেশাই গুবরে পোকার মতো ঘুরছে। রতন মাস্টারের কথাগুলো সে ভুলতে পারেনি। হামেশাই ঐ কথাগুলো বর্শার ফলার মতো বিঁধতো তাকে। শেষে রতন মাস্টার চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় বাজারে খুন হয়ে গেল। তার লাশ পাকা রাস্তায় পড়েছিল দু'দিন। তার শেষযাত্রায় কাঁধ লাগানোর জন্য একটা লোকও এগিয়ে এল না।

সোমের উপর অনেকবারই হামলা করার চেষ্টা করেছিল শনির দল। ভাগ্যের জোরে অল্পের জন্যে বেঁচে গিয়েছে সোম। জঙ্গলের পথে সেই একটা বুনো খরগোস। ওরা জীবনভর চেষ্টা করলেও ওর সঙ্গে পারবে না।

রোদ ঢলে পড়েছে জঙ্গলের পথে।

রবিকে কোল থেকে নামিয়ে একটু জিরিয়ে নেয় ঝুমুর। ছেলেটা একদম কোলঘেঁষা। মায়ের গায়ের গন্ধ ছাড়া তার একমদ চলে না। এই ছেলেকে নিয়ে গ্রামে থাকবে কি করে? বড় হলে তাকেও তো মিটিং মিছিলে যেতে হবে। হাতে অস্ত্র তুলে নিতে হবে। নয়তো রতন মাস্টারের মতো লাশ হতে হবে।

এসব ভেবে মাঝেমধ্যে আঁৎকে ওঠে ঝুমুর।

তার বাবা হরিহর এসে খোঁজ নিয়ে যায় তার। মেয়ের একাকীত্ব দেখে বাবার মনে কষ্ট হলে বলে—ঝুমুর! এদিককার জায়গা-জমি বেচে দিয়ে তুই এবার শহরের দিকে উঠে যা। এখানে কি আছে মা, যার জন্য তুই এত কষ্ট ভোগ করবি!

বড়ো শ্বশুর তার পথ চেয়ে থাকে। তাকে ফেলে ঝুমুর যাবে কি করে? তাছাড়া সোম যদি ফিরে এসে না দেখা পায়? মনে মনে কষ্ট পাবে বেচারা? কি ভাববে ঝুমুরকে নিয়ে? ভাববে ভুলে গিয়েছে! এক মুহূর্তের জন্য ঝুমুর কি তকে ভুলতে পেরেছে? প্রত্যেকটা রাত তাকে সোমের কথা মনে করিয়ে দেয়। খিড়কির দুয়ার খুলে সোম চলে যাচ্ছে পুকুরয়াড়িতে। সদর দরজায় শিকলির ঠকঠক আওয়াজ...। এই আওয়াজ কি অন্য কোথাও গেলে খুঁজে পাবে? শ্বশুরটিপার মাটি, সে তো সোনার চেয়েও দামী। সোনা ফেলে কেউ ছাই মুঠো করে ধরে?

দু পায়ে এখন জড়িয়ে গিয়েছে মায়ার শেকল।

বুড়োটার মন ভালো থাকলে গুনগুন করে গান গায়। বহুদূর থেকে সেই ভাঙা গলার গান শুনতে পেল ঝুমুর। গানের আনন্দটা নিতে গিয়ে করুণ হয়ে গেল তার মুখটা। বুকের মধ্যে ডানা ভাঙা মথের ফড়ফরাড়ি শুরু হল।

বৃহস্পতি বুড়ো গাইছিল— যে যায় সে আর ফেরে না, ফেরা কি সহজ ভাইরে, ভাই...।

ঝুমুর আগড় খুলতেই পাশের ঘরের সুদর্শন ছুটে এল। সে বেশ হাঁপাচ্ছিল। সামান্য দম নিয়ে সে বলল—বৌদি, তোমার শ্বশুরের মাথাটা একেবারে গিয়েছে। সারাদিন সেই একই গান গেয়ে চলেছে। ঝুমুর কিচ্ছু না বলে দূরের দিকে তাকাল।

সুদর্শন বলল, একটা মজার কথা শুনবে? তোমার শ্বশুরমশাই বলছিল, আজ দুপুরবেলা নাকি তোমার সোম এসেছিল ঘরে। খাওয়া দাওয়া করে সে আর দাঁড়াল না। আবার আসবে বলে জঙ্গলের পথ ধরল। তোমার শ্বশুরের কথাটা কি বিশ্বাস হয়?

—বিশ্বাস - অবিশ্বাসের কী আছে। সবই মনের ব্যাপার। বিরক্তির চোখে তাকিয়ে উঠোন অব্দি হেঁটে গেল ঝুমুর। রবি ঘ্যানঘ্যান করে কাঁদছিল। তার কান্না শুনে বৃহস্পতি বুড়ো বলেছিল—দাদুভাই, কাঁদছ কেন? জান, আজ তোমার বাবা এসেছিল। আমাকে দেখা দিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল!

ঝুমুরের সঙ্গে এরকম প্রায়ই দেখা হয় সোমের। সোম তাকে ডাকে। যেতে পারে না ঝুমুর। স্বপ্নের মধ্যে সে এসে তাকে আদর করে। বিছানা ভিজে যায় ঘাম এবং উত্তেজনায়।

নিজেকে সামলে নিয়ে কাঁদো-কাঁদো গলায় ঝুমুর বলে, ওগো কবে আসবে? তোমার ছেলেকে একবার চোখের দেখা দেখে যাবে না?

হাওয়া হা-হা হাসতে হাসতে বনবাদাড়ে হারিয়ে গেল। শাঁখা-পলার দিকে তাকিয়ে সময়কে হারিয়ে দিয়ে কেঁদে উঠল ঝুমুর।